Bangladesh Journal of Political Economy

© 2017 Bangladesh Journal of Political Economy
Vol. 33, No. 2, December 2017, pp. 075-094
Bangladesh Economic Association
(ISSN 2227-3182)

অর্থনীতি ও নৈতিকতা

আবদুল আউয়াল মিন্টু*

সারকথা: *অর্থনীতিবিদরা প্রায়ই উদ্যোক্তা, ব্যবসায়ী, বাজার, সরকার, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, সবার নানা ত্রুটি ও নৈতিকতা নিয়ে প্রশ্ন করেন। তাদের ধারণা, জনসাধারণ সর্বদাই নিজ নিজ স্বার্থ পূরণে নিয়োজিত থাকেন। তবে এসব কথা তাঁরা অস্পষ্ট ভাষায় বলেন; সে কারণে সাধারণ মানুষ তা বোঝে না। তবে, সমাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে অর্থনীতিবিদদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান বাংলাদেশে তারা সেই ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়েছেন বলে কেউ কেউ মনে করেন।*

অর্থনীতি ও বাস্তব পৃথিবীর মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরির ক্ষেত্রে রাজনীতির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এ দুটো বিষয়, একে অন্যের উপর নির্ভরশীল ও গভীর সম্পর্কিত, দীর্ঘদিন ধরে অর্থনীতিবিদরা বিষয়টি এড়িয়ে গেছেন। যেকোনো দেশে আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের চাবিকাঠি সেই দেশের রাজনীতির কাঠামোতে নিহিত। রাজনৈতিক ক্ষমতার ব্যবহারে ভারসাম্য থাকলে কোনো গোষ্ঠীর পক্ষে একক আধিপত্য বিস্তার সম্ভব হয় না। বরং, সামাজিক গোষ্ঠীগুলো একে অন্যের সাথে সহযোগিতা করতে বাধ্য হয়। সমাজে বিভিন্ন গোষ্ঠীর পারস্পরিক সহযোগিতা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক তৎপরতার উৎকর্ষতা বাড়ায়। ভৌত অবকাঠামোর মতো সমাজ অবকাঠামো ও সামাজিক মূলধন অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে।

উদার অর্থনৈতিক সমাজের বিরুদ্ধে যুক্তি হলো ঐ সমাজের অর্থনীতি মুনাফার দ্বারা পরিচালিত। মুনাফা মানেই লিপ্সা। তাই মুনাফা অনৈতিক। মুনাফার সঙ্গে লোভের সম্পর্ক চিরাচরিত। অন্যদিকে তত্ত্ব হলো মুনাফা "নিয়ামকের" ভূমিকা পালন করে। সবাই চায় ব্যবসায়ীদের মাঝে নৈতিকতাবোধ থাকা উচিত। সমাজে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য ও আয়ের সমতা-অসমতার কারণে নৈতিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠে। কিন্তু, প্রত্যাশিত এই নৈতিকতার পরিমাপ ও পরিধি কি হবে তা কেউ জানে না। নৈতিকতার নানা দিক ও মাত্রা আছে। ব্যক্তিগত সততা, ন্যায্য আচরণ, ন্যায়ভিত্তিক সমাজব্যবস্থা, যথাসময়ে দেনা পরিশোধ, এ সবই যেমন মানুষের ব্যক্তিগত নৈতিকতার সাথে জড়িত, তেমনি দেশের রাজনীতি ও অর্থনীতির সাথে সম্পর্কিত। তবে কোনো পরিমাণের নৈতিকতাই মানুষের আয়ে সমতা আনবে না, ধনী ও দরিদ্রের ব্যবধান কমবে না। বৈষম্য হ্রাসের মূল চাবিকাঠি মূলত ন্যায়ভিত্তিক সমাজে অধিক উৎপাদনের মাঝে নিহিত।

কুলিন ও অভিজাত মহলের হাতে যখন ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকে, তারা সে ক্ষমতার অপব্যবহার করে অনৈতিকভাবে অতিরিক্ত সম্পদ করায়ত্ত্ব করে। এতে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়ে। দুর্নীতি গণতন্ত্র ও উন্নয়নের পথে সবচেয়ে বড় বাধা। দুর্নীতির কারণে অবৈধ সম্পদ গড়ে

* সাবেক সভাপতি, এফবিসিসিআই

> *উঠে, সংগঠিত ও সংঘবদ্ধ অপরাধের প্রসার ঘটে, আইনের বিকৃতি হয়। অবৈধ টাকার মালিকরা হয়ে ওঠে প্রতিনিধিত্বশীল কর্তৃপক্ষের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অনৈতিক রাজনীতিই হলো দুর্নীতির মূল উৎস।*
>
> *বাংলাদেশে কিছুসংখ্যক ব্যক্তির হাতে পুঞ্জীভূত ক্ষমতা, তাদের স্বৈরতান্ত্রিক ও অসাংবিধানিক আচার-আচারণ, সামাজিক বিশৃঙ্খলা, আইনের শাসনের দুর্বলতা, অকার্যকর প্রতিষ্ঠান ও নিচুমানের দুর্বল শাসন ব্যবস্থা দেশের শ্রমজীবি মানুষগুলোর কাছ থেকে প্রাপ্য সামাজিক ন্যায়বিচার, সম্প্রীতি, নিরাপত্তার পরিবেশ ও নিত্যনূতন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের সুফল কেড়ে নিচ্ছে। এসবই নৈতিকতার সাথে জড়িত।*
>
> *সমাজে নৈতিকতার মাত্রা বাড়াতে হলে সুশীল সমাজের সবাইকে ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে দেশের রাজনীতি, আইনের শাসন, সামাজিক মূলধন সৃষ্টি, উৎপাদন প্রক্রিয়া ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে সব বাধা-বিপত্তি সরাতে হবে। এতে একদিকে সামাজিক অস্থিরতা প্রশমিত হবে, বিনিয়োগ ও সম্পদ বাড়বে, আয়বন্টনে বৈষম্য কমবে এবং নৈতিকতার উৎকর্ষতা বাড়বে।*

অর্থনীতিবিদদের ভূমিকা

অর্থনীতিবিদরা প্রায়ই উদ্যোক্তা, ব্যবসায়ী, বাজার, সরকার, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সবার নানা ত্রুটি বের করেন। কিন্তু, যখন তাদের বিরুদ্ধে কোনো কথা ওঠে, কোনো অভিযোগ করা হয় তখন তারা মনে করেন তাদের প্রতি সুবিচার করা হচ্ছে না। কারণ, তারা দাবি করেন দেশে যা কিছু খারাপ ঘটে, তা হোক মন্দা অর্থনীতি অথবা বিনিয়োগে স্থবিরতা, সেগুলোর কারণ আর যা-ই হোক তারা নন। তারা বড় জোর সেসব অশুভ বার্তা-আভাসের বাহক মাত্র। তাদের মতে, রাজনীতিকরাই বাস্তবে অর্থনীতির ব্যবহারিক প্রয়োগ করেন। আর জনসাধারণ তাদের দৈনন্দিন অর্থনৈতিক কাজকর্ম ও লেনদেন করতে গিয়ে সর্বদাই নিজ নিজ স্বার্থ পূরণে নিয়োজিত থাকেন। ব্যবসায়ীদের কোন নৈতিকতা নেই। তারা অর্থনৈতিক মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে পণ্য ব্যবহারকারী গ্রাহকদের বিরুদ্ধে সর্বদা চক্রান্তে লিপ্ত থাকেন। বিনিয়োগকারীরা ব্যাংক ও অন্যান্য ঋণ প্রদানকারী সংস্থা থেকে টাকা নিয়ে অবৈধ ও অন্যায়ভাবে সেই টাকাকে অন্যত্র কাজে লাগান। অনেক সময় টাকা ফেরৎ না দিয়ে বিদেশে পাচার করেন। মুনাফার প্রতি তাদের লোভ-লালসা ও অভিশাপ সমাজে অসমতা ও বৈষম্য সৃষ্টি করে।

এ কথা সত্যি, অর্থনীতিবিদরা বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক বিষয়ে তাদের শক্তিশালী বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে সরকারি নীতির ওপর আলোকপাত করে ঐসব বিষয় সাধারণ্যে এনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এদিক থেকে তারা অর্থনৈতিক ও সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলোকে বিচার-বিশ্লেষণ করে তাদের মতামত দিতে পারেন। আর সেগুলো এক পর্যায়ে অসীম শক্তিশালী হয়ে যারা নিত্য অর্থনীতির ব্যবহারিক প্রয়োগ ও চর্চা করেন তাদের উপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করতে পারে। এফ এ হায়েক অর্থনীতি শাস্ত্রে তার তরুণ অনুসারীদের এই বলে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, "কোনো বিষয়ে কেউ কঠোর বিতর্কের অবতারণা করলে তাকে প্রায় সুনিশ্চিতভাবেই একঘরে ও কোনঠাসা হয়ে পড়তে হবে, তার জনপ্রিয়তা থাকবে না"। অবশ্য এর পরেও তিনি বলেছেন, "অর্থনীতিবিদকে তার উদ্যোগ ও প্রয়াসে জনসমর্থন ও সহানুভূতি কী পাওয়া গেল তা নিয়ে মাথা ঘামালে চলবে না"। এ হলো জ্ঞানের নৈতিক দিক, যাকে সমুন্নত রাখতে হবেই"। আমাদের সমাজে একজন অর্থনীতিবিদের দায়িত্ব কত গুরুত্বপূর্ণ তা হায়েক-এর এ মন্তব্য থেকে উপলব্ধি করা যায়।

অর্থনীতি বনাম রাজনীতির নৈতিকতা

অর্থনীতি ও বাস্তব পৃথিবীর মধ্যে শক্তিশালী সেতুবন্ধন তৈরির ক্ষেত্রে সবসময়ই রাজনীতি এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যে কোনো সমাজেরই একটা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামো থাকে। এই কাঠামো একই সঙ্গে সে সমাজের বাজারব্যবস্থা ও সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। তাই সমাজ, ধনীই হোক আর গরীবই হোক, অবশ্যই তার দু'টি অংগ থাকবে। অপরিহার্য এই অংগ দু'টি হলো অর্থনীতি আর রাজনীতি। অর্থনীতির মাধ্যমে রাজনীতি বিকশিত হয় তবে রাজনীতি অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। রাজনীতিকে বাদ দিয়ে কোনো বাজার আদর্শই বিকশিত হতে পারে না। এ দুটি অংগ একে অন্যের পরিপূরক। যে কোনো একটির সীমাবদ্ধতা বা সংকীর্ণতা মানেই হলো অসম, অস্থির, দুর্বল ও বৈষম্যর সমাজ।

অ্যাডাম স্মিথ, জন স্টুয়ার্ট মিল ও আগের শতকের অন্যান্য বিখ্যাত অর্থনীতিবিদরা ব্যবসা, বাণিজ্য, বাজার পরিচালনা ইত্যাদি নিয়ে তাদের বিশ্লেষণমূলক লেখায় সে সময়ের সরকার-রাজনীতিসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সেগুলোর গঠন ও কার্যকলাপ প্রক্রিয়াকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছেন।

এছাড়া শ্রমিকদের বিশেষত্ব অর্থনীতিতে অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ দুটো বিষয়ের—একে অন্যের উপর নির্ভরতার গুরুত্ব ও গভীর সম্পর্ক দীর্ঘদিন ধরে অর্থনীতিবিদরা এড়িয়ে গেছেন। সম্প্রতি এই বাস্তবানুগ বিষয়টি ব্যাপক আলোচিত হচ্ছে। বিশ শতকের অর্থনীতিবিদ জোসেফ শুমপিটার প্রথম এ বিষয়ের বিশদ পর্য্যালোচনা করেন। এরপর থেকে অর্থনীতিবিদরা যে কোনো দেশের জন্য নূতন অর্থনৈতিক মডেল বা নীতি তৈরি করার সময়ে সে দেশের ব্যবসা, বাণিজ্য, রাজনীতি, শ্রমিকের বিশেষত্ব ও সে সাথে আঞ্চলিক বাণিজ্য - রাজনীতি ইত্যাদিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছেন। এরপরও তারা শ্রমিক বিভাজন ও বিশেষায়নের মত বিষযগুলোর, যেমন প্রতিষ্ঠান, বিধি-বিধান, লেনদেনের খরচকে (Transaction Cost) তেমন একটা গুরুত্ব দেননি। প্রতিষ্ঠানের সামর্থ্য বা লেনদেনের ব্যয় সে দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যেই নিহিত থাকে। অ্যাডাম স্মিথের "উদার বাজার ব্যবস্থাপনাকে" পুঁজিবাদের নৈতিক দর্শনের (Moral philosophy of capitalism) ভিত্তি হিসেবে মেনে নিলেও একটা নৈতিক অর্থনৈতিক (Moral economy) ব্যবস্থা কেবল তখনই সফল হতে পারে যখন, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার একটা চমৎকার সংমিশ্রণ ও সন্নিবেশন থাকে। কিন্তু রাষ্ট্রের যাবতীয় ক্ষমতা যদি গুটিকয়েক ব্যক্তির হাতে বা বিশেষ বিশেষ মহলের হাতে কুক্ষিগত হয়ে যায়, তাহলে এই বিশেষ ব্যক্তিরা তাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে দেশের যাবতীয় সম্পদের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে তুলে নেয়ার চেষ্টা করে। এটিই রাজনৈতিক ও অর্থনীতির স্বাভাবিক প্রকৃতি ও চরিত্র। এই নীতি অবশ্যই অ্যাডাম স্মিথের উদারনৈতিক বাজার ব্যবস্থাপনা বিরোধী।

বিগত দশকগুলোতে বাংলাদেশের রাজনীতিতে অশুভ, অনৈতিক ও অসাংবিধানিক আচরণ এবং বিভিন্ন সময়ে অপরিণামদর্শী অর্থনৈতিক নীতির কারণে সরকার বদল হলেও দেশে শাসন ব্যবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি। দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা মুষ্টিমেয় কয়েকজন নেতার হাতে কুক্ষিগত হয়ে যাওয়ার ফলে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া সরকারগুলো; আইনের শাসন, গণতান্ত্রিক রীতি-নীতির প্রতি কোনো গুরুত্ব না দিয়ে স্বৈরাচারী আদলে দেশ চালিয়েছে। ফলে একদিকে মানুষ যেমন শংকিত আবার অন্যদিকে তারা সংশয়ে রয়েছেন এই ভেবে যে, বারবার সরকার বদলানো সত্বেও কেন তাদের দুর্ভোগ দিন দিন শুধু বেড়েই চলেছে। তাই একদলের কাছ থেকে আরেক দলের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের চেয়ে এ মুহূর্তে সমাজের নৈতিক দর্শন, লক্ষ্য হওয়া উচিত রাজনীতির আমূল সংস্কারের মাধ্যমে সামাজিক গোষ্ঠীগুলোর

মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য এনে, প্রথমে ‘সামাজিক সমস্যার সমাধান’ করা। সমাজে ক্ষমতার ভারসাম্য বিধানের মাধ্যমে রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান একটি বড়, একমাত্র উপায়। সাথে সাথে যদি সমাজে অধিকার ও দায়বদ্ধতার বিষয়টি নিশ্চিত করা যায়, তাহলে অ্যাডাম স্মিথের উদার অর্থনৈতিক দর্শন, ন্যায়ভিত্তিক অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সহায়ক হতে পারে।

সামাজিক গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করে দিলে তারা একে অন্যের সাথে দরকষাকষির মাধ্যমে আয়ের দায়িত্বশীল বণ্টন ও ন্যায়ভিত্তিক অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করে সমাজে ব্যাপক আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবে। ক্ষমতার ভারসাম্যের বিধান করে, অনেক সমাজ প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ঘটিয়েছে। নৈতিক চরিত্র বা আচার ব্যবহার সমাজের কোনো একক গোষ্ঠীর ব্যাপার নয় - তা হোক সরকার, রাজনৈতিক দল, অথবা ব্যবসায়ী শিল্প গোষ্ঠী। তাই মানুষ তাঁর চিরাচরিত বৈশিষ্ট্য হিসেবে সুযোগ পেলেই এককভাবে অথবা কোনো গোষ্ঠীর সমর্থনে বাজারের ওপর একক আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করে। যখন রাজনৈতিক ও ক্ষমতা ভারসাম্যের বিধান থাকে তখন কোনো একক গোষ্ঠীর পক্ষে তা সম্ভব হয় না। তখন তারা একটি উদারপন্থী প্রজাতান্ত্রিক (গণতান্ত্রিক) শাসনব্যবস্থা ও বাজার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। সাথে সাথে একই কারণে তাঁরা দরকষাকষির মাধ্যমে আপোষরফা করে একটি প্রয়োজনভিত্তিক সামাজিক কাঠামো গঠন করতে বাধ্য হয় যেমন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, আইনি নিশ্চয়তা (আইনের শাসন), দুর্নীতিরোধ, ক্ষমতার ভারসাম্য রাখার স্থায়ী বিধান, মেধার পরিপালন, উদ্যোক্তাদের উদ্যোগে সহায়তা, মানবধিকারের সংরক্ষণ, কোম্পানীর প্রশাসনে সুশাসন, ইত্যাদি। সুষ্ঠু নিয়মনীতির ভিত্তিতে এগুলো তৈরি হয় বলে সমাজের প্রায় সব মহলে এর একটি গ্রহণযোগ্যতাও থাকে। গ্রহণযোগ্যতা থাকলে সেটিকেই ‘নৈতিক’ বলে ধরে নেয়া হয়।

অর্থনীতি বনাম সামাজিক নৈতিকতা

মূলধন বলতে সবাই বিনিয়োগ বা ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য অর্থের লেনদেনমূলক ধারকর্জকে বোঝেন। বিনিয়োগ প্রসারে আর্থিক মূলধনের সহায়ক হিসেবে সামাজিক মূলধন একটি অতীব অতিজরুরি উপকরণ। বলা যায়, আর্থিক মূলধন বিনিয়োগের পূর্বশর্ত। সামাজিক মূলধন উদ্ভাবনী ও উদ্যমভিত্তিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ভিত্তি রচনা করে। যেসব দেশ দারিদ্র্যের ফাঁদে আটকে আছে সেগুলোকে আর্থসামাজিক উন্নয়নের রাস্তা ধরে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হলে প্রথমেই সামাজিক বিশৃঙ্খলার দুষ্টচক্র থেকে যেভাবেই হোক বেরিয়ে আসতে হবে। বাংলাদেশে বর্তমান সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার প্রেক্ষাপটে যদি আর্থসামাজিক উন্নয়নের পথে পা বাড়াতে হয় তা হলে অবশ্যই এ বিষয়ে বড় রকমের পদক্ষেপ নিতে হবে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও কায়িক ও যান্ত্রিক– এই উভয় অর্থনীতি এবং সস্তা শ্রমভিত্তিক উৎপাদনের অর্থনীতি থেকে জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতিতে উত্তরণের জন্য চেষ্টা চলছে। এ কারণে গোটা রাষ্ট্রসত্তার কর্তব্য হলো দেশের সামাজিক অবকাঠামোকে সঠিকভাবে গড়ে তোলা।

ব্যক্তি, পরিবার, পারস্পরিক বিশ্বাস, বিভিন্ন সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী (communities), সমাজ প্রতিষ্ঠান ও নানাবিধ ব্যবসা, বাণিজ্যিক ও পেশাদার সংগঠন যা সমাজকে এক সূত্রে বেঁধে রাখে, ঐক্যবদ্ধ করে, সংযোগ সৃষ্টি করে, সেসবের মিশ্র ও সামষ্টিক মূল্যবোধ থেকে সামাজিক মূলধন গড়ে উঠে। বলাবাহুল্য, সামাজিক মূল্যবোধগুলোর সামষ্টিক মূল্য বা সামাজিক মূলধনের পর্যাপ্ততা আর্থিক মূলধন বিনিয়োগের পূর্বশর্ত। তাই অর্থনৈতিক উদ্যোগ ও বিকাশ বা উন্নয়ন সম্পর্কিত সমস্যা সমাধান কেবল

অর্থনীতিবিদদের তৈরি মডেলেই নিহিত থাকে — এটি এক মারাত্মক ভুল ধারণা। একটি দেশে উন্নয়নের সুযোগ-সুবিধা ও সম্ভাবনাগুলোকে পরিপূর্ণভাবে সদ্ব্যবহার করতে হলে সে দেশের আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়গুলোকে পুরোপুরি হিসেবে আনতে হবে।

বস্তুতপক্ষে সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যাগুলো অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সংস্কার ও পরিবর্তনের যে কোনো উদ্যোগের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। সেজন্যই ঐ উদ্যোগগুলোর প্রতি সুশীল সমাজ, বিভিন্ন গোষ্ঠী, বিভিন্ন ব্যবসা-বাণিজ্যিক সংগঠনসহ সাধারণ নাগরিকদের সচরাচর মানসিক চিন্তা-চেতনার স্বরূপ সঠিকভাবে নির্ণয় করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একই সাথে সরকারকে ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ও অন্যান্য রাজনৈতিক ও সামাজিক গোষ্ঠীগুলোর সাথে সম্মিলিতভাবে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে অবশ্যই একটা জাতীয় ঐকমত্য গড়ে তুলতে হবে। বিশ্বায়নের এ যুগে অত্যন্ত প্রতিযোগিতাপূর্ণ বিশ্ববাজারে সাফল্য লাভ করতে হলে সরকারকে সামাজিক মূলধন বা সামাজিক সম্পদের পুঞ্জীভূত সঞ্চয় (accumulated savings) বাড়ানোর একটি কৌশল অবশ্যই গড়ে তুলতে হবে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রবার্ট পুটন্যাম বলেছেন, "সামাজিক গোষ্ঠীগুলোর শক্তিশালী নেটওয়ার্ক সাধারণত অনেকভাবেই সামাজিক মূলধন বা সামাজিক সম্পদ বৃদ্ধির অভিন্ন লক্ষ্য অর্জনের প্রয়াসে সহযোগিতার পথ সুগম করে দেয়। এই নেটওয়ার্কগুলো পুনঃপুনঃ সামাজিক কাঠামোর মধ্য থেকেই বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীকে সহযোগিতাভিত্তিক উদ্যোগ গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করে সমাজের কার্যকর ভূমিকা সম্পাদনকারীদের নানা কর্মতৎপরতার মধ্যে যোগসূত্র তৈরি করে। এসব কার্যকলাপের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে পারস্পরিক প্রয়োজনে ইতিবাচক সাড়া দেয়ার প্রমিত আদর্শ, বর্ধিত তথ্যপ্রবাহ, আস্থাযোগ্যতা বৃদ্ধি, সামাজিক সহযোগিতা ও সামাজিকতার উন্নয়নে উৎসাহ এবং প্রেরণা ইত্যাদি। এগুলোর মধ্য দিয়ে সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মাঝে একটি অভিন্ন সমঝোতার কাঠামো প্রতিষ্ঠিত হলে পারস্পরিক সামাজিক সহযোগিতার পথ সুগম হয়, সে সহযোগিতা সমাজকে স্থিতিশীল রাখে ও সামাজিক মূলধন বাড়ায়। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য তাই শক্তিশালী ও সক্রিয় সামাজিক নেটওয়ার্কগুলোর উপস্থিতি ও কার্যকারিতা অপরিহার্য।

সামাজিক গোষ্ঠীগুলোর পারস্পরিক সহযোগিতা ও সক্রিয় তৎপরতা, অর্থনৈতিক তৎপরতার উৎকর্ষগত গুণমানকে বিশেষভাবে উন্নত করে। উন্নত সমাজগোষ্ঠী পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে যে সামাজিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করে সেটিই সামাজিক মূলধন, যাকে এক কথায় আর্থসামাজিক উন্নয়নের চাবিকাঠি বলা যেতে পারে। সামাজিক মূলধন বৃদ্ধি অর্থনৈতিক বিনিয়োগ বৃদ্ধির পূর্বশর্ত।

সামাজিক মূলধন ও অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতা

এছাড়া 'সামাজিক মূলধন' বলতে সমাজ গোষ্ঠীগুলোর পারস্পরিক সহযোগিতার প্রকৃতি ও পরিসরকেও বোঝানো হয়। সামাজিক মূলধন এ ধরনের গোষ্ঠীগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক কতটা নিবিড় তার পরিমাপও। পারস্পরিক সহযোগিতা ও নিবিড় সম্পর্ক সমাজ অবকাঠামো ও সমাজ গোষ্ঠীগুলোকে ক্রমান্বয়ে টেকসই ও শক্তিশালী করে তোলে। আর টেকসই সমাজ অবকাঠামো অবলম্বন করে শক্তিশালী সমাজ গোষ্ঠীগুলো দ্রুতগতিতে সামাজিক মূলধন সৃষ্টি করে। তাই সামাজিক মূলধন বলতে সমাজ প্রতিষ্ঠানগুলোর চলতি সহযোগিতাসহ অতীতের সব সফল প্রয়াসের মোট রেকর্ড ও যোগফল বোঝায়। ভৌত অবকাঠামোর মতো সমাজ অবকাঠামো ও সামাজিক মূলধন অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতা বাড়াতে

সক্ষম। এ সবের যথেষ্ট ইতিবাচক বহির্দেশীয় সম্ভাবনাও আছে। কেননা, সামাজিক মূলধন নিশ্চিত উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় ও পূর্ণাঙ্গ উপকরণ।

এমন কিছু কিছু বিষয় ও উপাদান আছে যেগুলো পরিমেয় নয় অথচ এসব উপাদান ও বিষয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে অর্জনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এ কথা অর্থনীতিবিদরা স্বীকার করেন। এভাবে বলা যায়, সমাজ প্রতিষ্ঠানগুলোর পারস্পরিক সহযোগিতায় সৃষ্ট সামাজিক মূল্যবোধের ক্রমপুঞ্জিত সঞ্চয় সমাজের ধারাবিন্যাস ও পুনর্বিন্যাসে সহায়ক, আর তাই সেই সঞ্চয়ই সামাজিক মূলধন। রবার্ট পুটন্যাম আরও বলেছেন, "জনসমাজের সুযোগ-সুবিধা সমৃদ্ধ সংঘজীবন দেশে শাসনকে সহজ করে ও তার ফলে অধিক কার্যকর গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়"।

মানুষ স্বভাবগতভাবে সামাজিক জীব। মানুষ নিজ মৌলিক তাড়না ও সহজাত প্রবৃত্তিবশে কিছু নৈতিক মূল্যবোধ গড়ে তোলে। আর সেই মূল্যবোধের কারণেই তারা সমাজবদ্ধ হয়। সততা, অঙ্গীকার বা চুক্তিরক্ষা ইত্যাদি নৈতিক মূল্যবোধের মতো সামাজিক সৎগুণগুলো কেবল নৈতিক মূল্যের কারণেই সমাজে প্রয়োজন বললে ভুল হবে; আসলে এগুলোর বোধগম্য বস্তুমূল্যও আছে। ভৌত সম্পদ; যেমন জমি ও মেশিনপত্র, মানব সম্পদ; যেমন দক্ষতা ও জ্ঞান এবং সামাজিক সম্পদ; যেমন বিশ্বস্ততা, সামাজিকতা, সংঘ জীবন ও পারস্পরিক সহযোগিতা উৎপাদন বাড়ায় ও জাতির জন্য সম্পদ সৃষ্টি করে। আর সে কারণেই জাতীয় পর্যায়ে সামাজিক সম্পদের অর্থনৈতিক মূল্য আছে। সামাজিক মূলধনের বিপরীতমুখী প্রবৃদ্ধি মানে আর্থিক বিনিয়োগে ঘাটতি ও নিম্নমুখী উৎপাদন। বাংলাদেশে বর্তমান বিনিয়োগ পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলে, এটি আর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রয়োজন নেই। সামাজিক মূলধন তাই যে কোনো ধরনের অর্থনৈতিক প্রয়াসের পূর্বশর্ত।

সামাজিক মূলধনের উপকারিতা অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলের বাইরেও সম্প্রসারিত। একটি সুস্থ, সুশীল সমাজ গড়ার ক্ষেত্রে সামাজিক মূলধন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। টেকসই সামাজিক মূলধন সমাজ উন্নয়নে সমাজ গোষ্ঠীগুলোকে শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে সহায়তা করে। কেননা, সুশীল সমাজ প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রবল প্রাণশক্তি দেশের সব গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও দেশের প্রাণবন্ত অর্থনীতির গতি বৃদ্ধি করা ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য অত্যন্ত জরুরি। অন্যদিকে, যেহেতু এগুলো আর্থসামাজিক উন্নয়নের মূল উপাদান, সেহেতু ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশবেষ্টিত একটি বিচিত্র সমাজে বিভিন্ন গোষ্ঠীকে তাদের স্বার্থ রক্ষায় একজোট হতে সহায়তা করে। সমাজের বিভিন্ন স্বার্থের ধারক ও বাহকের কার্যকর ভূমিকায় অবতীর্ণ গোষ্ঠীগুলো যথাযথভাবে ঐক্যবদ্ধ হতে না পারলে রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রবল শক্তি জনসমাজ ও তাদের মতামতকে উপেক্ষা করতে পারে। সেহেতু আর্থসামাজিক উন্নয়নে শক্তিশালী সুশীল সমাজ অপরিহার্য, আর সামাজিক মূলধন শক্তিশালী সুশীল সমাজ গঠনের অন্যতম উপকরণ। সামাজিক মূলধন ছাড়া যেমন আর্থিক বিনিয়োগ হবে না, তেমনি সুশীল সমাজ হতে পারে না, সুশীল সমাজ ছাড়া গণতন্ত্রও সফল হতে পারে না।

সামাজিক মূলধনের পরিমাপ করা সহজ নয়। এফবিসিসিআই বা অর্থনীতি সমিতির কার্যকর ভূমিকার মূল্যায়ন বা অর্থনৈতিক উন্নয়নে এ সংগঠনগুলোর অবদান কিভাবে পরিমাপ করা হবে? তবে, সামাজিক মূলধনের ইতিবাচক মূল্য পরিমাপের তুলনায় তার নেতিবাচক মূল্য পরিমাপের বিষয়টি বরং সহজ। মূল্যায়ন আরও সহজতর হতে পারে যখন সামাজিক মূলধনের অনুপস্থিতির কারণে সামাজিক কার্যক্রমে অস্বাভাবিকতা বা অকার্যকারিতার মূল্যায়ন করা হয়। সামাজিক অবিশ্বাস, অপরাধের হার, হত্যাকাণ্ড, সহিংসতা, চুরি, পারিবারিক বিপর্যয়, কিশোর অপরাধপ্রবণতা, পরিবারে একে অন্যের প্রতি অশ্রদ্ধাবোধ, মাদকের অপব্যবহার, খুন, গুম, বিচারহীনতা, এ্যাসিড নিক্ষেপ, ধর্ষণ, ঝগড়াবিবাদের ফলে সমাজে

মামলা-মোকদ্দমার সংখ্যা, মিথ্যা মামলা, হয়রানিমূলক মামলা, আত্মহত্যা, দুর্নীতি, করফাঁকি, ট্রাফিকবিধি লঙ্ঘন, বিচারে বিলম্ব, আইন অমান্য করার প্রবণতা, নিজ হাতে আইন তুলে নেয়া, পুলিশের নৃশংসতা ও নিষ্ঠুরতা, মন্দ শাসন ও সাংবিধানিক সঙ্কট এগুলো একক ও সামষ্টিকভাবে মূল্যায়ন করা হয়।

এগুলো যতোই বাড়বে ততোই সমাজের মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটতে থাকবে, সাথে সাথে সামাজিক মূলধনের ঘাটতি দেখা দেবে। সামাজিক মূলধনের অনুপস্থিতি সুনিশ্চিতভাবেই সমাজ কাঠামোকে অস্বাভাবিক ও অকার্যকর করে তোলে। অন্যদিকে, সামাজিক মূলধনের পর্যাপ্ততায় সমাজে শৃঙ্খলা ফিরে আসে ও সামাজিক স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার কার্যক্রম, বিশৃঙ্খলা, অস্থিতিশীলতা, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, অপরাধপ্রবণতা, ইত্যাদির মূল্যায়ন করলে সহজেই বোঝা যায় যে, সমাজে একটা অস্বাভাবিকতা বিরাজ করছে। আর যখন এ রকম পরিস্থিতি দীর্ঘদিন বিরাজ করে তখন অর্থনৈতিক উদ্যোগ-উদ্যম ব্যর্থ হয়। আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার আরও অনিবার্য অবনতি ঘটে এবং সমাজ ধীরে ধীরে শাসনের অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে। এসবের উৎস দেশের রাজনীতিতে নিহিত। উপরোক্ত বিষয়গুলো সচরাচর সামাজিক নৈতিকতার সাথে সম্পর্কিত। সে কারণেই সুশীল সমাজ, সমাজ প্রতিষ্ঠান, মানুষের নৈতিক মূল্যবোধ ইত্যাদির সমন্বয়ে সৃষ্ট "সামাজিক মূলধনের" প্রয়োজনীয়তাকে খাটো করে দেখার কোনো অবকাশ নেই, বরং সামাজিক মূলধন হলো আর্থিক মূলধন বিনিয়োগের পূর্বশর্ত।

অর্থনীতি ও নৈতিকতা: মুনাফা

মানুষকে যেমন বেঁচে থাকার জন্য নিঃশ্বাস নিতে হয়, তেমন ব্যবসায়ীদেরকেও টিকে থাকার জন্য মুনাফা অর্জন করতে হয়। ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান অথবা কোম্পানিগুলোর কাজকর্ম নৈতিকও নয়, অনৈতিকও নয়। তবে, যারা এসব ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক বা পরিচালনা করেন তাদের নৈতিকতা-অনৈতিকতার প্রশ্ন অবশ্যই আছে। এছাড়া মুনাফা এক দিকে যেমন সমাজের দক্ষতার এক অপরিহার্য মৌলিক উপাদান - যে দক্ষতা অপচয় পরিহারের দক্ষতা, অন্যদিকে আবার দক্ষতা হচ্ছে উপযুক্ত প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে উৎপাদনযোগ্য পণ্য ও সেবাপণ্যের সঠিক পরিমাণ উৎপাদন নির্ধারণের দক্ষতা। নৈতিকতা সম্পর্কে বেশিরভাগ পাশ্চাত্য ধারণায় মুনাফা ভালো জিনিস। কিন্তু মুনাফার লিপ্সা ভালো নয়।

পৃথিবীর তিন প্রধান ধর্মে সুদে অর্থ ধার দেয়াকে দুটি কারণে নিরুৎসাহিত করা হয়। দুটি কারণের একটি হলো; "কোনো কাজ না করে তথা কোনো উৎপাদন না করেই টাকাকে আরও বেশি টাকায় পরিণত করার কাজ অনৈতিক"; দ্বিতীয়, এ কাজটি হলো একজন ব্যক্তি কর্তৃক তার সহযোগী আরেকজনের কাছ থেকে ঘৃণ্য ও লজ্জাস্কর মুনাফা করা। ইহুদি, খ্রিষ্টান ও ইসলাম এ তিনটি ধর্মই সুদ সম্পর্কে একই ধরনের ব্যবস্থাপত্র দিয়েছে। তবে যেহেতু অর্থের লেনদেনমূলক ধারকর্জ ছাড়া বিনিয়োগ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভালো কাজ করতে অক্ষম, খ্রিষ্টান দেশগুলো সেহেতু সুদের বদলে আরেকটি মাঝামাঝি ব্যবস্থা হিসেবে চালু করেছে। এর নাম তারা দিয়েছে '*ইন্টারেস্ট*' । আর মুসলমানরা একই ধরনের ব্যবস্থা দিয়েছে যাকে বলে *মুরাদাবাচ*। তারা এটাকে কর্জদাতা ও কর্জগ্রহণকারীর মধ্যেকার বিষয় হিসেবে ধরে থাকে।

মুনাফা-নিয়ামক বনাম নৈতিকতা

চিরায়ত উদারনৈতিক সমাজের বিরুদ্ধে যে সব যুক্তি-তর্ক দাঁড় করানো হয়, সে সবের অন্যতম হচ্ছে- ঐ সমাজের অর্থনীতি মুনাফা পরিচালিত। মুনাফা মানেই লিপ্সা, তাই মুনাফা অনৈতিক। মুনাফার সঙ্গে

লোভের সম্পর্ক চিরাচরিত। তাই ব্যবসায়ীরা দেশের জনগণের সামষ্টিক স্বার্থকে বড় করে দেখে না। তারা শুধু তাদের সঙ্কীর্ণ স্বার্থকেই বড় করে দেখে, যেমন তারা সমাজের কল্যাণসাধন বা পরিবেশের মত বিষয়গুলোকে নিয়ে মাথা ঘামায় না। পক্ষান্তরে, অবাধ উদ্যোগভিত্তিক সমাজে (Free enterprise Society) মুনাফাই হলো ঐ সমাজের চালিকা শক্তি। এই সমাজে বাজার মানের নিরিখে যদি কেউ কোন একটা ব্যবসাতে খুবই বেশি মুনাফা করতে থাকে তাহলে অন্য আর একজন একই ধরণের পাল্টা ব্যবসা গড়ে তোলে - যাকে বলা যায় 'চিরায়ত উদারনৈতিক মূলনীতিভিত্তিক তৎপরতা'। এভাবে ব্যবসায়ে নতুন যে প্রতিযোগী এলেন তিনি একই পণ্য কম দামে বা আরও উন্নতমানের পণ্য একই দামে বাজারে ছাড়বেন অথবা পণ্যের মান ও দামের একটা সমন্বয় করে তা বাজারে তুলবেন যার ফলে মূল পণ্য উৎপাদক যিনি বর্তমানে বেশী মুনাফা করছেন তার পণ্যের দাম কমাতে বাধ্য হবেন। এতে মুনাফাও কমে যাবে। এভাবে প্রয়োজনীয় কাটছাঁটের পর যে মুনাফা দাঁড়াবে তা হবে বিনিয়োজিত মূলধন থেকে বাজারভিত্তিক আয়।

একইভাবে শ্রমের জন্য যে মজুরি দেয়া হয় সেটি হবে শ্রম বাবদ বাজারভিত্তিক আয়। মুনাফার জন্য সন্ধানী তৎপরতার কারণেই উৎপাদনমূলক সম্পদ, কাঁচামাল ও অন্যান্য উপকরণ ঐ সব খাতে প্রবাহিত হয় যে সব খাতে পণ্য বা পরিসেবার চাহিদা বেশী অথচ সরবরাহ কম। আবার যদি কোন খাতে চাহিদার থেকে সরবরাহ বেড়ে যায়, তাহলে এসব সম্পদ যেখাতে চাহিদা বেশী সে খাতের দিকে প্রবাহিত হবে। কেননা চাহিদা বেশী, সরবরাহ কম - মানেই হলো মুনাফা বেশী। এভাবে মুনাফা এক নিয়ামক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। এর ফলে সঠিক পণ্য ও পরিসেবা, সঠিক পরিমাণ ও সঠিক মূল্যে উৎপাদিত হয় ও যুক্তিসঙ্গত মূল্যে এ সব পণ্যের চাহিদা মেটানো হয়।

যারা নীতিগতভাবে মুনাফার বিরোধী তারা মুনাফার প্রেরণা বা অভিপ্রায়কে অতিরঞ্জিত করে তুলে ধরেন। বহু উদ্যোক্তা যেমন মুনাফা দ্বারা অনুপ্রাণিত হন তেমনি পেশাদারি সন্তুষ্টির কারণেও প্রেরণা বোধ করেন। যদিও অস্তিত্ব রক্ষার জন্য মুনাফার অনস্বীকার্য আবশ্যকতা। অবশ্য, এর বিরোধীরা সাধারণত অহেতুক জোর করে দাবি করেন যে মুনাফা লোভ, অবিবেচনা, পরিবেশ ধ্বংস ও অন্যান্য অপ্রীতিকর সমস্যার সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। অন্যদিকে, ক্ল্যাসিক্যাল উদারনৈতিকতাবাদীরা যে অর্থনৈতিক তত্ত্বে বিশ্বাস করেন সেটি হলো "মুনাফা মাত্র নিয়ামকের" কাজ করে। তাই মুনাফা নিয়ামক হিসাবে নিয়ন্ত্রণ করে; কোন বাজারে কোন পণ্য উৎপাদিত হবে, কে হবে ভোক্তা, কত হবে পণ্যের মূল্য ও উৎপাদনের সাথে সম্পর্কিত আয় এবং কে কতটুকু পাবে। এ সব কার্যকলাপের যে কোনোটি যেমন লোভ, লোলুপ ও অবিবেচনার সাথে সম্পর্কিত হতে পারে, তেমনি আবার এসব তৎপরতার সাথে মহানুভবতা, দয়াদাক্ষিণ্য, ও পেশাদারি সন্তুষ্টিও সম্পর্কিত। সমাজতন্ত্র বহুকাল ধরে 'আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা' হিসেবে বিবেচিত ও প্রশংসিত হয়ে এসেছে। এ ব্যবস্থার জোরগলায় প্রশংসা করে তারাই যারা মুনাফার বিরোধী। কিন্তু, সেই কথিত সমাজতন্ত্রীদেরকেই পরবর্তীকালে দেখা গেছে তাঁরা চরম লোভ, অসহিষ্ণুতা, হিংসাত্মক রাজনীতি ও নিষ্ঠুরতার প্রতিমূর্তি হয়ে উঠেছেন।

আর্থ-সামাজিক রূপান্তর ও নৈতিকতা

অর্থনীতির বিশ্বায়নের আওতায় সবাই প্রত্যাশা করে যে ব্যবসায়ীদের মাঝে নূতন করে একটি নৈতিকতাবোধ গড়ে উঠবে। ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ও তাই চায়। কিন্তু, দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি যে, এই নৈতিকতার পরিমাপ ও পরিধি কি হবে তা আজও পরিমাণ করা সম্ভব হয়নি। স্থান-কাল পরিক্রমায়

অন্যান্য পরিবর্তনের (রাজনৈতিক ও সামাজিক) সাথে অর্থনৈতিক নৈতিকতাও বদলায়। যেমন আজকের সমাজে দাসত্ব, দস্যুতা, হত্যা-খুন, এমনকি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রদেরকে বেত্রাঘাত ও নির্যাতন অনৈতিক বিবেচিত হচ্ছে, অথচ একসময় সেগুলো নৈতিক পর্যায়ে গ্রহণযোগ্য ছিল। এমনকি কিছুকাল আগে পর্যন্ত খুন ও হত্যা শুধুমাত্র আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে ঐ বিশেষ ব্যক্তির অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হতো। কিন্তু, এখন খুনকে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সংঘটিত জঘন্যতম অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়।

কিছুদিন আগেও আজকের উন্নত ও গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে নারীদের ভোটাধিকার ছিল না, কিন্তু এখন নারী-পুরুষের এ বৈষম্য নৈতিকতার দিক থেকে গ্রহণযোগ্য নয়। তবে কোনো পরিমাণের সামাজিক নৈতিকতাই মানুষের আয়ে সমতা আনবে না, ধনী ও দরিদ্রের ব্যবধান কিংবা দারিদ্র্য কমাবে না। ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান ও দারিদ্র্য হ্রাসের মূল চাবিকাঠি মূলত ন্যায়ভিত্তিক সমাজে অধিক উৎপাদনের মাঝে নিহিত। অর্থনৈতিক তত্ত্ব আমাদের শিখিয়েছে; উদারনৈতিক সমাজ ব্যবস্থা অর্থনীতির সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করে। অস্তিত্বশীল, প্রাপ্য ও ব্যবহারযোগ্য সম্পদ ও প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহারে প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে সর্বাধিক পণ্য ও সেবাপণ্য উৎপাদন সম্ভব। দক্ষ, সহানুভূতিশীল ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজে সম্পদ ও প্রযুক্তি যা-ই থাকুক, সেই সমাজে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় ও তাত্ত্বিক দিক থেকে সেই সমাজে দরিদ্র থাকলেও এত বৈষম্য থাকার কথা নয়।

ক্ষমতার কেন্দ্রায়নঃ সম্পদ ও আয় বিলি-বন্টনের নৈতিকতা

অনেকেই সহজে ধারণা করেন, দারিদ্র্যের কারণ গরিবদের নিম্নমানের বুদ্ধিমত্তা। বাংলাদেশে বহু গরীব লোকেরই বুদ্ধিমত্তা (I.Q.) আমাদের মতো মধ্যবিত্ত মানুষের চেয়ে কোনো অংশেই কম নয়। তারা উদ্যোগ গ্রহণেরও সামর্থ্য রাখেন। এছাড়াও অর্থনীতির ইতিহাস থেকে দেখা যায়, একটি উদারনৈতিক সমাজ ব্যবস্থায়, আয় ও সম্পদের সমবন্টন না হলেও ক্ষমতার ভারসাম্য সমাজকে সুষম বণ্টন ব্যবস্থার কাছাকাছি এগিয়ে নিয়ে যায়।

আধুনিক পরিমাপমূলক সমীক্ষা ও জরিপের কল্যাণে আমরা সুনিশ্চিত জানি, অধিকতর উন্নত দেশগুলোর তুলনায় স্বল্প-উন্নত ও কম গণতান্ত্রিক সমাজে সম্পদ ও আয়ের বিলিবন্টনে বৈষম্য অনেক বেশী। গণতান্ত্রিক সমাজে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে আয়ের বিলিবন্টনে সমতা আসে। এশিয়া, আফ্রিকা বা লাতিন আমেরিকার হোক বা মধ্যযুগের ইউরোপের মতো আগেকার দিনের কোনো কম উন্নত দেশ হোক– এই সব দেশের কতগুলো বৈশিষ্ট্য অভিন্ন। অনুন্নয়ন ও দারিদ্র্যের প্রধান কারণ শাসক দলের হাতে অতিরিক্ত ক্ষমতার কেন্দ্রায়ন। অতিরিক্ত ক্ষমতার অধিকারীরা রাজনৈতিক ক্ষমতা করায়ত্ত করার সাথে সাথে অতিরিক্ত সম্পদও তাদের হাতে কুক্ষিগত করতে ব্যস্ত হয়ে যায়। এতে জনসাধারণ ও অর্থনীতিকে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ সামর্থ্যে কাজ করতে দেয়া হয় না। কেন্দ্রিভূত ক্ষমতা সমাজে সম্পদ সৃষ্টি ও আয়ের সুষম বিলি বন্টনের পথে পর্বতসমান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। এর ফলে পণ্য ও সেবা পণ্যের সর্বোত্তম উৎপাদন হতে পারে না। বাজার শক্তিগুলো তার আপন নিয়মে চলার জন্য যে সব বিধিবিধান দরকার সেগুলো গড়ে ওঠে না বা অতিরিক্ত বিধিবিধানের কারণে আটকে পড়ে বাজার তৎপরতার গতিরোধ ঘটে, সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে ক্ষমতার বিলিবন্টন হয় না, সেই সুযোগে অপ্রতিহত গতিতে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি বিস্তারলাভ করে। ক্ষমতা এক হাতে বা মুষ্ঠিমেয় গুটিকয় হাতে পুঞ্জিভূত হলে দুর্নীতি তার স্বাভাবিক নিয়মে ক্ষমতাবানদেরকেই লাভবান করে। কেননা, তাদের অবস্থান সুবিধাভোগীর অবস্থান।

দুর্নীতি, রাজনীতি ও নৈতিকতা

ক্ষমতার বিকেন্দ্রায়ন বা বিলি বণ্টনের প্রক্রিয়ায় যদি কোন প্রতিযোগী শক্তিশালী বিরোধী রাজনৈতিক দল বা পরিবার গড়ে ওঠে সে অবস্থায় ক্ষমতাসীন ও বিরোধী - উভয় পক্ষই একে অন্যের দুর্নীতি কমানোর প্রয়াসে পরস্পরকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। এটা হলো তত্ত্ব। তবে বাংলাদেশে নিজ পক্ষের দুর্নীতিকে দমন করার পরিবর্তে নব উদ্যমে দুর্নীতিবাজদের সহায়তা করে। এভাবে দুর্নীতি দমন আইনগুলো, অপর্যাপ্ত মাত্রায় হলেও, ক্ষমতাসীনরা বেছে বেছে শুধুমাত্র তাঁদের বিরোধীদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে, বিরোধীদের কণ্ঠরোধ ও দমন করে রাখার হাতিয়ার হিসেবে। যদিও ক্ষমতাসীনদের অপরাধ বিরোধী দলীয় ব্যক্তিদের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়, বরং বেশী। আর বিরোধীপক্ষ শুধুমাত্র ক্ষমতাসীনদের বিরোধীতা করে নিজেদের দুর্নীতির দায় থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য ও জনগণকে বিভ্রান্ত করে আবার ক্ষমতায় ফিরে আসার জন্য। বাংলাদেশের মতো কার্যত দ্বি-দলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এ ধরনের হাতিয়ার কাজে লাগানোর সুযোগ সবচেয়ে বেশী। কেননা, উভয় পক্ষই কার্যত একই ধরনের কর্মসূচির প্ল্যাটফর্মে নির্বাচনী লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়। উভয় দলেই রয়েছে অত্যন্ত বেশি মাত্রায় রাজনৈতিক অপরাধীদের চক্র, আর এ অপরাধী চক্রের বিস্তৃতি তৃণমূল পর্যায় অবধি বিস্তৃত। দুর্নীতির মূল উৎপাটনের সত্যিকারের কোনো অভিপ্রায় কোন সময়ই, কোনো পক্ষ থেকে জোরালোভাবে দেখা যায়নি।

বিশ্বসমাজ দুর্নীতিকে একটা দুষ্টক্ষত হিসেবে শনাক্ত করেছে। গণতন্ত্র ও উন্নয়নের পথে দুর্নীতি যেমন ক্ষতিকর তেমনি সমাজ কল্যাণ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পথে দুর্নীতি এককভাবে সবচেয়ে বিপদজ্জনক বাধা। বিশ্বাসভঙ্গ, সরকারি পর্যায়ে প্রতারণা, ব্যক্তিস্বার্থকে জাতীয় স্বার্থের উর্ধ্বে স্থান দেয়া, উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গের স্বজনপ্রীতি, সত্য ঘটনা গোপন, অবৈধ সুবিধা লাভের জন্য যোগসাজস, বিলম্বে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, ক্ষমতার একতরফা অনুশীলন, পরিকল্পিতভাবে জনগণকে বিভ্রান্ত করা, এসবই দুর্নীতির অন্তর্ভুক্ত। দুর্নীতি সম্পদের অবৈধ সঞ্চয় বাড়ায়, সংগঠিত ও সংঘবদ্ধ অপরাধের প্রসার ঘটায়, আইনের বিকৃতি ঘটায়। সমাজে প্রতিযোগিতার প্রবণতা ক্ষুণ্ন করে, সম্পদের অসম বণ্টন ঘটায়, কলোবাজার অর্থনীতির প্রসার ঘটায়, কুশাসন প্রতিষ্ঠা করে, সম্পদ পাচার বৃদ্ধি করে, প্রবৃদ্ধি ও সংস্কারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, রাজনৈতিক সংঘাত ও অস্থিতিশীলতা বৃদ্ধি করে, রাজনৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটায়। অবৈধ টাকার মালিকরা হয়ে ওঠে প্রতিনিধিত্বশীল কর্তৃপক্ষের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও ক্ষমতাধর। যে কোনো সমাজে দুর্নীতির উৎস হলো অনৈতিক রাজনীতি ও সামাজিক অবক্ষয়।

নৈতিকতার পূর্বশর্ত: রাজনৈতিক ক্ষমতার ভারসাম্য বিধান

পরিতাপের বিষয় হলেও কথাটা সত্যি, "আরেকটি শক্তি না থামিয়ে দেয়া পর্যন্ত শক্তি বা ক্ষমতার সম্প্রসারণ ও অপব্যবহার চলতেই থাকে।" সামন্তপ্রভু, অপরাধী, গডফাদার, একনায়ক, গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকার বা স্থানীয় সরকার যে বা যারা ক্ষমতাধর নির্বিশেষে সবার ক্ষেত্রেই এ নিয়ম প্রযোজ্য। তাই সমাজের পরিপূর্ণ অর্থনৈতিক সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি করে সুষম বণ্টনের মাধ্যমে আয়ের বৈষম্য এবং ধনী ও গরিবের ব্যবধান কমাতে হলে অর্থনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, আইন বিশারদ, সমাজ কর্মী, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা, ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী তথা সুশীল সমাজের সবাইকে অবশ্যই চিরায়ত উদারনৈতিকতার দর্শনকে সামনে রেখে এক সাথে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করতে হবে। রাজনৈতিক সংস্কারের মাধ্যমে রাজনৈতিক ও সামাজিক গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে কেন্দ্রিভূত ক্ষমতাকে ভাগাভাগি করে দিয়ে সামাজিক উত্তেজনা প্রশমিত করে আমাদের উৎপাদন প্রক্রিয়া ও অর্থনৈতিক

প্রবৃদ্ধির সব বাধাবিপত্তি দুর করতে হবে। নইলে উদ্যোক্তা, সম্পদ, প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা যাবে না। দেশে টেকসই প্রবৃদ্ধি হবে না। সম্পদ ও আয় কোনটাই বাড়বে না। তবে ধনী-দরিদ্র্যের বৈষম্য দিন দিন বেড়ে যাবে।

মানবীয় জীবন-জীবিকার ক্রম-উত্তরণ ও অর্থনৈতিক তৎপরতার সূচনা: প্রাচীনকাল

কবে, কখন, কিভাবে বিভিন্ন জনসমাজ ও দেশে সম্পদ ও আয়ের বৈষম্য শুরু হয়েছে কিংবা বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর আয়ের বিলি-বণ্টনে অসমতা শুরু হয় তা সম্ভবত কেউ সঠিক বলতে পারবে না। প্রাচীন মিসরীয় ও ভূমধ্য উপসাগরীয় রোমান জনসমাজের আয় ও বিত্ত, আফ্রিকীয় ও এশীয় (পারস্য ব্যতীত) জনসমাজগুলোর চেয়ে বেশি হওয়ার সম্ভাবনা সবদিক থেকেই প্রবল। স্থায়ী নিবাসী কৃষি সমাজ প্রতিষ্ঠা (Settled agriculture) ও রোমান সাম্রাজ্যের উন্নতি যখন তার শিখর স্পর্শ করেছে - এ দুয়ের মধ্যে সময়ের ব্যবধান আনুমানিক ছয় থেকে আট হাজার বছর। তবে ইতিহাসের সাক্ষ্য-প্রমাণের সাথে এই কাল পরিসরের মিল নেই বলে আমরা শুধু এটুকু অনুমান করতে পারি, ইতিহাসের এ সুদীর্ঘ কালপরিক্রমায় যুদ্ধবিগ্রহ, বিশ্বাসঘাতকতা, চক্রান্ত ও হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে অগণিত রাজ্য, সাম্রাজ্য, নানান সভ্যতার আবির্ভাব, বিকাশ ও বিলুপ্তি ঘটার নানা দৃশ্যের অশেষ মিছিল এখনো চলেছে।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, যে কোনো সভ্যতার বুনিয়াদ গড়ে ওঠে কোনো না কোনো অর্থনৈতিক কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে। এ কাঠামোতে ভর করে গড়ে উঠেছে অনেক বিশাল সাম্রাজ্য। এসব সাম্রাজ্যের কোনো কোনোটি অস্তিত্ব রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে শত শত বছর। তাদের অর্থনৈতিক কার্যকলাপের সাফল্য তাদের রাজনৈতিক সাংগঠনিক কাঠামোর আলোকে নিরূপিত ও নির্ধারিত হয়েছে। উল্লিখিত ছয় থেকে আট হাজার বছরের কাল পরিসরে জনসংখ্যা নজিরবিহীনভাবে বেড়েছে। সেই সাথে বেড়েছে মানববসতির স্থানিক ব্যাপ্তি। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলগুলো অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ হয়ে ওঠে এই আমলেই। এই কাল পরিক্রমায় শিকার-সংগ্রহের (hunting gathering) মানবীয় জীবিকার ক্রম উত্তরণ ঘটে কৃষিকর্মের পরিকল্পিত উৎপাদন তৎপরতায়। আর পরিশেষে, কৃষিই হয়ে ওঠে স্থায়ী নিবাসী চরিত্রের প্রধান অর্থনৈতিক তৎপরতা।

ঐ একই সময়ে, প্রথমবারের মতো রাজনৈতিক রাষ্ট্র সংগঠনের প্রথম আবির্ভাবও ঘটে। রাষ্ট্রীয় অভ্যুদয়ের সাথে যুগপৎ আগমন ঘটে যুদ্ধ ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার। এ সময় প্রযুক্তির তাৎপর্যপূর্ণ বিকাশ ঘটে। উল্লিখিত আট হাজার বছরের মেয়াদে লৌহ যুগের অবসান শেষে শুরু হয় ব্রোঞ্জযুগ। এ সময় ব্যবসায়-বাণিজ্যের বিকাশ ও সম্প্রসারণ ঘটে। এর অল্পকালের মধ্যেই বাজার গড়ে ওঠে। প্রথমবারের মতো পৌর এলাকার পত্তন হয়। নগরগুলোর আকার-আয়তন ও নগর প্রশাসনের জটিলতা বেড়ে যায়। সেই সাথে নানা ধরনের অর্থনৈতিক তৎপরতাও বৃদ্ধি পায়। এক প্রান্তে সুমের ও মিসর পুনঃবণ্টনমূলক অর্থনৈতিক কার্যকলাপের প্রতিনিধিত্ব করে ও অন্য প্রান্তে মূল্য-নির্ধারক বাজার সম্প্রসারণের প্রতিনিধিত্ব করে হেলেনীয় গ্রীস ও রোম। ঐ সময়ে বিভিন্ন ধরণের অর্থনৈতিক কার্য্যকলাপের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে নানা ধরণের অর্থনৈতিক সংগঠন। একই সময়ে ব্যক্তি পর্যায়ে "সম্পত্তির মালিকানা ও অধিকার" প্রতিষ্ঠিত হয়। দাসত্বের আকারে এ সব অধিকার বিকশিত হয় পণ্য, ভূমি ও শ্রমকে নিয়ে। এই আমলেই তাৎপর্যপূর্ণ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়। যার বুনিয়াদে এক দিকে বাড়তি জনসমষ্টির অস্তিত্ব রক্ষা সম্ভব হয় ও অন্যদিকে, মানুষের জীবনযাত্রার সাধারণ মান উন্নত হয়।

সম্পদ ও আয়ের বণ্টনে অসমতা: প্রাচীনকাল

তবে এই একই সময়ে মানুষের আয়ের বণ্টনও বিষম হয় ওঠে। জীবন যাত্রার মান উন্নতির সাথে সাথে সমাজের নানা ধরনের পেশাজীবীর আয়ে আরও বেশি ও ব্যাপক বৈষম্য তৈরি হয়। মানবেতিহাসের অত্যন্ত গোড়ার দিকে এ সব ঘটনা ঘটে। এ ছাড়াও স্থায়ী নিবাসী কৃষিকর্মের সাথে সাথে বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংগঠন গড়ে ওঠে। জমিতে কি ফসলের আবাদ করা উচিত, কোথায় তা আবাদ করা উচিত, কখন তা করা উচিত, ফসল কাটতে বা তুলতে হবে কখন, কেমন করে কে বা কারা কিংবা কোন আর্থসমাজিক সংগঠন ফসল বোনা ও কাটার মধ্যবর্তী মেয়াদে সম্পর্কিত কাজগুলো ভাগ করে দেবে - এ সব বিষয় অনেক বেশি জটিল হয়ে ওঠে। কারা কাজগুলো করবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার কাজটিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এছাড়া যে কোনো স্থায়ী নিবাসী জনসমাজে দুর্ভিক্ষ বা খরার মতো সম্ভাব্য দুর্দিনের জন্য পণ্য/ফসল ইত্যাদি মজুত করে রাখাও প্রয়োজন ছিল বলেই তখনকার কৃষি জনসমাজে নতুন নতুন পেশা বা কর্মবৃত্তির সৃষ্টি হতে থাকে। খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দে হস্তশিল্পে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জিত হয়। কুমার, কামার, তাঁতী, রাজমিস্ত্রি, ছুতার, জাহাজ নির্মাতাদের আবির্ভাব ঘটে এই সময়ে। শ্রমের এ বিশেষায়নের ফলে শিকার ও সংগ্রহ-নির্ভর যাযাবর এবং তুলনামূলকভাবে কম অসমঞ্জস বা সমজাতীয় সমাজে এক ব্যাপক পরিবর্তন আসে। বিশেষায়ন দ্রত গতিলাভ করার ও এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আয়ের বৈষম্যও বাড়তে থাকে। কৃষিতে কারিগরি উন্নতি ও বৃহদায়ন শিল্প বিকাশের ফলে মধ্যযুগেই সম্ভবত আয়ের এই পার্থক্য অনেক বেশি বেড়ে যায়।

তবে আয়ের ব্যবধান সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় হয়ে ওঠে আঠারো ও উনিশ শতকের শিল্প বিপ্লবের পর। ১৪২৭ সালে, ইতালির ফ্লোরেন্স নগরীর শতকরা ১০ জন অধিবাসী মোট সম্পদ ও বিত্তের শতকরা ৬৮ ভাগের মালিক ছিল। অন্যদিকে, ঐ নগরীর শতকরা ৬০জন অধিবাসী কেবলমাত্র শতকরা ৫ ভাগ সম্পদের মালিক ছিল। ষোলো শতকের তুরস্কে সামরিক বাহিনীর সদস্যবর্গ ও শাসকমহলের লোকজন তুর্কী জনসমাজের সবচেয়ে বেশি সম্পদ ও বিত্ত নিয়ন্ত্রণ করতো। ১৮ শতকের সুবে বাংলা তথা বঙ্গদেশ সবচেয়ে সম্পদশালী মুঘল প্রদেশ যার কেন্দ্র ছিল মুর্শিদাবাদ। ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের আগে পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে আয়ের পার্থক্য ছিল বিরাট। পাশ্চাত্যের ধনী ও গরিব জনসমাজের মধ্যে আয়ের ক্ষেত্রে এই বিপুল ব্যবধান অপেক্ষাকৃত কম উন্নত দেশের জনসমাজেরও বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে। অবশ্য ১৮৫০-এর পর আয়ের এই সুবিশাল বৈষম্য উন্নত দেশগুলোতে কমে আসতে শুরু করলেও, কম উন্নত দেশগুলোতে বাড়তে থাকে। এর রেশ চলে এক শতকেরও বেশি কাল ধরে। ১৯৭০-এর দশকের শেষভাগে উন্নত দেশগুলোর জনসমাজের ভেতরে আয়ের ব্যবধান কমলেও, কম উন্নত দেশগুলোতে তা বাড়তে থাকে। এসব সমাজে কিছু কিছু লোক ভাগ্যবলে ও সুযোগ পেয়ে হঠাৎ ধনী হলেও তা ছিল নেহাৎই নিয়মের ব্যতিক্রম। ইদানিংকালে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে ক্রমান্বয়ে সম্পদ বাড়ছে, ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য তার চেয়েও দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে।

মজুরি ও মুনাফার বিলি-বণ্টনে অসমতা: সাম্প্রতিককাল

অবশ্য সাম্প্রতিককালে নুতন নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও প্রয়োগ পরিস্থিতির আরও একবার মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। অর্থনীতি ক্রমেই বিশ্বায়িত হয়ে ওঠার আলোকে 'তুলনামূলক সুবিধা' এখন "প্রতিযোগিতামূলক সুবিধার" কাছে হার মানছে। এ নিয়মের আওতায় কোন বিনিয়োগকারী যদি বিশেষ কোনো শিল্প ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক উৎপাদনে সমর্থ না হয়, তাহলে তাকে সে উৎপাদন বন্ধ করে দিয়ে অন্যত্র ভাগ্য

পরীক্ষায় যেতে হবে। নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনার কারণে নতুন নতুন পণ্য বাজারে আসে। ঐ সব দ্রব্য প্রায়ই দামে হয় কম, আর সংশ্লিষ্ট উদ্যোগ প্রতিষ্ঠানের মুনাফা হয় বেশী। নতুন প্রযুক্তির ব্যবহারে শ্রমিকের উপান্তিক উৎপাদন হার বৃদ্ধি পায়। শ্রমিক-কর্মী স্বাভাবিক কারণেই উৎপাদিত পণ্যের বর্ধিত মুনাফার ভাগ চায়।

অর্থনীতির চাহিদা-সরবরাহ সূত্র অনুযায়ী যদি পুঁজির তুলনায় শ্রমিকের সরবরাহ কম হয় তাহলে তেমন ক্ষেত্রে শ্রমিকরা বেশি হারে মজুরি দাবি করতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রে শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা গত দু দশকে ক্রমাগত বাড়লেও দুর্ভাগ্যজনকভাবে তাদের মজুরি সেই হারে আগের শতকের মতো বাড়েনি। অথচ মুনাফা আরও বেড়ে গেছে। পরিসংখ্যান বিশ্লেষণে দেখা গেছে, মজুরি ও মুনাফার মধ্যে ব্যবধান ক্রমেই বেড়ে যাওয়ার প্রধান কারণ দক্ষ শ্রমিকের চাহিদা বৃদ্ধি এবং অদক্ষ শ্রমিকের সরবরাহ বৃদ্ধির পাশাপাশি অদক্ষ শ্রমিকের চাহিদা হ্রাস। ঠিক এ কারণটিই বাংলাদেশে এখন ক্রিয়াশীল। তাই সমাজের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে আয়ের যে বৈষম্য বিরাজমান তার কারণ এটাই হতে পারে। অর্থনীতিবিদগণ এ ব্যাপারে হয়তোবা পর্য্যালোচনা করে আরও বিশদ ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।

গত কয়েক দশকে যুক্তরাষ্ট্রের জনসমাজে একটা অপেক্ষাকৃত গরীব শ্রেণির অভ্যুদয় ঘটেছে। আর এতে প্রমাণিত হচ্ছে যে সমভিত্তিক উদার বাজার ব্যবস্থাপনার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা অত্যন্ত ধনী জনসমাজেও দেশের সম্পদ-বিত্তকে ন্যায্যভাবে বিলি-বন্টন নিশ্চিত করা খুব কঠিন ব্যাপার। তবুও এটি নিঃসন্দেহে প্রমাণিত যে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হয়তো সম্পদের সমভিত্তিক বণ্টন করতে পারে না বা সব সমস্যার সমাধান করতে না পারলেও ব্যবসা, বাণিজ্য ও বিনিয়োগের সম্প্রসারণ না করলে প্রবৃদ্ধির অনুপস্থিতিতে সমস্যা মোকাবেলা আরও বেশি কঠিন ও অপরিসীম হয়ে উঠে।

একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, অর্থনীতির বিশ্বায়ন ও তথ্য প্রযুক্তির দ্রুত ব্যবহারে নিকট ভবিষ্যতে আয়, দারিদ্র্য ও বিত্তের ক্ষেত্রে অসমতার রূপ বিভিন্ন হবে। কম উন্নত দেশগুলোর জন্য কঠিন সমস্যা হবে কম উন্নয়নের বৈশিষ্ট্যাবলী কাটিয়ে ওঠা। বলা বাহুল্য, এসব দেশে ক্ষমতা গুটিকয় ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত থাকে, যা উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির আদৌ অনুকূল নয়। তাই যতই কঠিন হোকনা কেন প্রথম কাজটি হলো, কেন্দ্রায়িত ও পুঞ্জিভূত ক্ষমতা বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক গোষ্ঠীর মাঝে বিলিবণ্টন করে ঐ ক্ষমতার ব্যবহারে একটি ভারসাম্য সৃষ্টি করা।

ক্ষমতার অপব্যবহার ও সম্পদ নিয়ন্ত্রণের অনৈতিকতা

কুলিন ও অভিজাত মহলের হাতে যখন ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকে, তারা সে ক্ষমতার অপব্যবহার করে অনৈতিকভাবে অতিরিক্ত সম্পদ করায়ত্ব করার কারণে অপেক্ষাকৃত গরীব শ্রেণি ও নতুন উদ্যোক্তারা নতুন ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পে বিনিয়োগের মাধ্যমে তাদের দক্ষতা ও সৃষ্টিশীলতাকে কাজে লাগাতে পারে না। ফলে তারা তাদের ক্ষমতা ও দক্ষতানুযায়ী আয়-উপার্জন থেকে বঞ্চিত হয়। শাসক ও কর্তাব্যক্তিরা তাদের ক্ষমতার লাগামে ঢিল দিতে আগ্রহী নন। কেননা সে রকম ক্ষেত্রে তাদের আশঙ্কা, তারা তাদের ক্ষমতার যথেষ্ট ব্যবহার ও অপব্যবহারের মাধ্যমে সাম্রাজ্য নিয়ন্ত্রণের আনন্দ উপভোগ হতে বঞ্চিত হবেন। অবশ্য দেশের সুশীল জনসমাজ যদি প্রাণবন্ত, সজীব, উন্মুক্ত মনের হয়, তাহলে তা সেই সমাজে শাসকদের হাতে থাকা অতিরিক্ত ক্ষমতার বিলিবণ্টন তথা বিকেন্দ্রায়নের প্রক্রিয়াটি সক্রিয় করে তুলতে সহায়তা করতে পারে। সাধারণ মানুষের সম্মিলিত শক্তি, সামর্থ্য ও সাফল্য এবং খোলা বাজারের অমিত শক্তি কাজে লাগিয়ে এটি সম্ভব। অন্যথায়, একদিকে সম্পদ বিলিবন্টনে বৈষম্য দিন দিন বাড়বে,

অন্যদিকে ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ও সহিংসতা বাড়বে। অস্থির সমাজে জনগণ কারণে-অকারণে একে অন্যের বিরুদ্ধে অঘোষিত যুদ্ধে লিপ্ত হবে। উচ্ছৃঙ্খল মানুষের সমন্বয়ে গঠিত বিশৃংখল সমাজ ধীরে ধীরে শাসনের অযোগ্য হয়ে পড়বে। সহিংস এবং অস্থির সমাজে বিত্ত ও সম্পদ কমে যায়। শুন্য কোষাগার থেকে বিলি-বণ্টনেরও কোন সুযোগ থাকে না। এতে সমাজে সম্পদের বৈষম্য আরো বেড়ে যায়।

এটি শুধু দেশের অভ্যন্তরে ধনী-গরীবের বেলায় নয়, বরং উন্নত ও কম উন্নত দেশের বেলায়ও প্রযোজ্য। দেশের সম্পদের বৈষম্যের ব্যবধান বাড়তে থাকলে দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বাড়িয়ে অর্থনীতির পূর্ণ সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে হবে। সম্পদকে পূর্ণভাবে বিনিয়োগ করে উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে আয়ের অসমতা ও দারিদ্র্য কমাতে হবে। এটি নিশ্চিত করতে বাংলাদেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক ও অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে একটি নুতন নৈতিক দর্শনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এই নতুন দর্শন অর্থনীতিবিদদের কাছ থেকে আশা করা অবাস্তব নয়, যদিও সবার কাছেই এ বিষয়গুলো রাজনৈতিক ইস্যু বলে মনে হবে।

বাস্তবিকপক্ষে, কাজগুলো রাজনৈতিক। তাই এসব বিষয়ে নির্দেশনার জন্য জনগণ রাজনীতিকদের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থায় কাঠামোগত নানা অভাব, গলদ-ত্রুটি-হিংসাত্মক রাজনীতির কারণে রাজনীতিকরা পরিবর্তনের প্রতি উপযুক্ত সাড়া দিতে ব্যর্থ হয়। তাই সুশীল সমাজের অন্যান্য সদস্য ও জনগণের সাথে তাল মিলিয়ে অর্থনীতিবিদদের উচিত প্রথমে রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানে ভূমিকা রাখা। সত্যিকার অর্থে, সমাজের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য অথবা দারিদ্র্য ও ধনী-গরীবের মধ্যে ব্যবধান কমাতে হলে প্রথমে কাজ হবে রাজনৈতিক সংস্কারে হাত দেয়া।

নৈতিকতার দিক ও মাত্রা

নৈতিকতার নানা দিক ও মাত্রা আছে। ব্যক্তিগত সততা, ন্যায্য আচরণ, চুক্তি অনুযায়ী মূল্য পরিশোধ, যথাসময় দেনা পরিশোধ, অতিরিক্ত মুনাফা করার লোভ থেকে বিরত থাকা, যথাযথ পরিমাপ প্রদান, গ্রাহকের সাথে সত্য কথা বলা - এ সবই যেমন মানুষের ব্যক্তিগত নৈতিকতার সাথে জড়িত, তেমনি অর্থনীতির সাথে সম্পর্কিত। অর্থনীতির বাইরেও অনেক বিষয় আছে যেমন নীতিবোধ, পরিণামদর্শিতা, নীতিনিষ্ঠা, আদর্শ, গুণাবলি ইত্যাদি সামাজিক মূল্যবোধ নৈতিকতার সাথে সম্পর্কিত। এছাড়াও আছে ধর্মীয় নৈতিকতা। সব ধরণের নৈতিকতাই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য সহায়ক পরিবেশ তৈরির ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন, অথনৈতিক মন্দা বা স্থবিরতা যা-ই হোক না কেন, এসব বিষয় সর্বদাই সমাজে সাধারণ মানুষের নৈতিকতার দিকমাত্রা নির্ধারণে প্রভাব ফেলে। নৈতিকতার সংজ্ঞা সম্পর্কে নানা মানুষ নানা ধারণা পোষণ করেন বলেই জনসমাজে নৈতিকতা নানাভাবে গঠিত। বিভিন্ন অর্থনৈতিক বিষয় দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন উপাদানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। যেমন সবার জন্য অবারিত সুযোগ, সহনশীলতা, সামাজিক সচলতা ও গতিশীলতা, ন্যায্যতা ও গণতন্ত্র। এছাড়াও বহু বিষয় ও অভিমত আছে যেগুলো নৈতিকতার বর্ণনায় যোগ করা যায়। যেমন কর্মসংস্থান ও আয়, স্বাস্থ্য পরিচর্যা, শিক্ষা ও দক্ষতা অর্জন, কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণের পর সামাজিক নিরাপত্তা, বাজেট ঘাটতি, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ, চাহিদা ও যোগান, বাজারে পণ্যের মূল্য ইত্যাদি সব কিছুই আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অর্থনীতির চর্চার সাথে জড়িত। অতএব অর্থনীতি কেবল সংখ্যা, সম্পদের বিলি-বরাদ্ধ বা বাজার ব্যবস্থার বিষয় নয়, বরং এর সাথে রাজনীতি, ইতিহাস, বাণিজ্য, বিনিয়োগ, উৎপাদন, করারোপ, মুদ্রার বিনিময় হার এবং জীবনের

প্রায় সব ক্রিয়াকাণ্ড জড়িত। আধুনিক অর্থনীতিতে প্রতিষ্ঠান, বিধিবিধান এবং কখন কোন পরিস্থিতিতে সরকারের হস্তক্ষেপ বা মধ্যবর্তীতার প্রয়োজন অথবা প্রয়োজন নেই এসব বিষয়কেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

বাজারব্যবস্থা বনাম সরকারের হস্তক্ষেপের ব্যাপারে আলোচনার সময় অনেকে আদর্শিক যুক্তিতর্কের সীমা ছাড়িয়ে যান। যদিও অর্থনীতির আলোচনায় রাজনৈতিক পক্ষ নেয়ার কোনো বিষয় নেই। কে কোন রাজনীতির সাথে জড়িত, কে কোন দলের সাথে জড়িত, অর্থনীতিতে সেটা কোনো প্রাসঙ্গিক ব্যাপার নয়। অর্থনীতি যেমন; কোনো ব্যবসা বা শ্রমিক সংগঠনকে সমর্থনের বিষয় নয়, তেমনি রাজনীতিতে আওয়ামী লীগ, বিএনপি বা কোনো রাজনৈতিক দলকে সমর্থনের কোনো বিষয় নয়। একজন ব্যক্তি-মানুষের জন্য অর্থনীতি হলো, "নিজ স্বার্থ উদ্ধার" বা নিজের জন্য মুনাফা করা। তিনি হতে পারেন - ব্যবসায়ী, পণ্য উৎপাদক, পণ্য বিপণনকারী, বা হতে পারেন আইনজীবী, শিক্ষক, চিকিৎসক, এমনকি রাজনীতিক। সমাজ গড়ার জন্য নিজস্বস্বার্থ উদ্ধার ও স্বীয়-অধিকার প্রতিষ্ঠা একটা কার্যকর উপায় বলে ধারণা করা যায়। কেননা, বাজারের দৈনন্দিন লেনদেন "আত্মস্বার্থ নির্ভর"। অর্থনীতি শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা অ্যাডাম স্মিথ যুক্তি দেখিয়ে বলেছেন, "সাধারণত সব ব্যক্তি, বাস্তবিকপক্ষেই কোন ব্যক্তিরই, যেমন জনস্বার্থকে উন্নীত করার কোন অভিপ্রায় থাকে না, তেমনি সে এও জানে না যে তার কর্মপ্রক্রিয়ার মাধ্যমে সে কতটুকু জনস্বার্থ উন্নীত করছেন। প্রত্যেক ব্যক্তির অভিপ্রায় হলো তার নিজ নিরাপত্তা বিধান; নিজের লাভ-মুনাফা নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকা। ঐ ব্যক্তি অনেক সময় তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি বা কোন লক্ষ্য অর্জনে কাজ করছেন সে নিজেই জানে না। মনে হয়, ঐ ব্যক্তির কাজকর্ম অদৃশ্য হাত দ্বারা পরিচালিত। এসব কাজ সমাজের জন্য যে খারাপ তা-ও নয়। বরং দেখা যায়, একজন ব্যক্তি যখন নিজের স্বার্থ অন্বেষণ করেন, একই সাথে তিনি সমাজের স্বার্থও উন্নীত করছেন, যদিও মোটেই এটি তার অভিপ্রায় ছিল না"।

অতএব, যখন কোনো ব্যক্তি কার্যত নিজের স্বার্থ উদ্ধারে ব্যস্ত, তার ঐ কাজের মাধ্যমে সমাজের অন্যেরাও উপকৃত হতে পারে। দৃষ্টান্ত হিসেবে; কোনো উদ্যোক্তা যদি একটা উন্নতমানের পণ্য তৈরি করে সস্তায় বিক্রি করে, তাতে উন্নত পণ্যের উপর অর্জিত মুনাফা যেমন নিজস্বস্বার্থকে সমুন্নত রাখে, তেমনি পণ্যের কম মূল্য সমাজে অনেকের জীবনমান উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। অতএব, নিজস্বস্বার্থ অন্বেষণের প্রক্রিয়ায় একজন ব্যক্তি কতো মুনাফা করলেন সেটা নৈতিক-অনৈতিকতার বা ঐ ব্যক্তি কতোখানি অনৈতিক সেটা বিচার্য বিষয় নয়, বরং বিচার্য বিষয় হলো; কম মূল্যে পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয়ের মাধ্যমে ক্রেতার সহায়তা হলো মূখ্য বিষয়। মোট কথা, ব্যক্তির 'আত্মস্বার্থ' উদ্ধারের কাজটাও অনেক সময় সমাজের সামগ্রিক স্বার্থ অর্জনে এক শক্তিশালী হাতিয়ার হতে পারে। তবে সামগ্রিকভাবে তা নির্ভর করে কতটুকু যথার্থভাবে কাজটি পরিচালিত হয়েছে।

প্রত্যেক মানুষ নিজেকে একজন অর্থনীতিবিদ মনে করতে পারেন। অথবা বলা যেতে পারে অর্থনীতির দৈনন্দিন চর্চাকারী। এটা মোটেই অযৌক্তিক নয়। কেননা, সবাই বেঁচে থাকার জন্য কাজ করছেন; ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করছেন; কোনো না কোনো পণ্য বা সেবা ক্রয় বা উৎপাদনে নিয়োজিত আছেন; কর দিচ্ছেন; নিজের ভরণপোষণের জন্য দৈনন্দিন মুদি দোকান থেকে কেনাকাটা করছেন। এসবই অর্থনীতির উপাদান।

সম্পদ সৃষ্টির প্রক্রিয়া

অর্থনীতি কেবল 'বিরল সম্পদ বিলিবন্টনের' চর্চা বললে ভুল হবে। যেমন তেল ও গ্যাস; এ দুটোই বিরল সম্পদ। তবে এটি নিজ থেকে আপনাআপনি কোন সম্পদ নয়। প্রাকৃতিক সম্পদ, যেমন গ্যাস মানুষের

মালিকানায় থাকা এই গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। এ হাতিয়ারের ব্যবহারে যেসব বাধাবিপত্তি আছে সেগুলো কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হলেই কেবল তা মানুষের কল্যাণে সত্যিকারের 'সম্পদ' হয়ে উঠতে পারে। গ্যাসের মতো অনিশ্চিত উদ্বায়ী জিনিসকে ঠিক সরাসরি 'সম্পদ' বলা যায় না। বরং, একে কোনো মিশ্র বা সমষ্টি সম্পদের অংশ বলাই সঙ্গত। কেননা, কোনো নির্দিষ্ট সময় (কাল) ও স্থানে (দেশ) প্রাকৃতিক গ্যাস বা এ জাতীয় পদার্থ উপকারী 'সম্পদ' হিসেবে কাজে লাগবে কিনা তা নির্ধারণের প্রক্রিয়ায় উপাদান, বস্তু, শক্তি, অবস্থা, শর্ত, সম্পর্ক, স্থাপনা, বিপণন ও নীতি ইত্যাদির এক জটিল সমষ্টি হিসেবে একযোগে ক্রিয়াশীল হলেই প্রাকৃতিক গ্যাস 'সম্পদ' হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

এ কারণে তেল, কয়লা ও গ্যাসের মতো প্রাকৃতিক কাঁচামালকে সম্পদ না বলে বরং বলা উচিৎ মানব কল্যাণের জন্য এগুলো এক মিশ্র ও সমন্বিত সম্পদের অংশবিশেষ। তাই, এ ধরনের সম্পদকে শুধুমাত্র অনেক উপাদান যেমন, বস্তু, শক্তি, প্রযুক্তি, আবিষ্কার, প্রক্রিয়াকরণ, শোধন, অবস্থা, সম্পর্ক পরম্পরা, প্রতিষ্ঠান, বাজার, নীতি, বিপণন — এগুলোর এক জটিল মিশ্রণ বা দ্রবণ বলে উল্লেখ করা যেতে পারে। এসব বিষয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক, প্রক্রিয়াকরণ ও প্রযুক্তির ব্যবহার ইত্যাদি সব মিলে শেষ পর্যন্ত নির্ধারণ করে প্রাকৃতিক গ্যাস বা এ ধরনের কাঁচামাল কিভাবে একটি নির্ধারিত সময় ও স্থানে মানুষের জন্য কল্যাণকর সম্পদ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। অতএব, এ ধরনের সম্পদকে শুধুমাত্র একটি নির্ধারিত অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের "উপায়" হিসেবে সংজ্ঞায়িত করতে হবে। অর্থাৎ আমাদের বুঝতে হবে যে ব্যক্তি ও সমষ্টি চাহিদা পূরণের প্রয়োজনীয় উপকরণের নামই সম্পদ। বস্তুত, 'উপায়' তার 'তাৎপর্য ও অর্থ' খুঁজে পায় মানুষের অভীষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণের মধ্যে। মানুষের অভীষ্ট লক্ষ্য বারবার বদলায়, অভীষ্ট বদলানোর সাথে সাথে 'উপায়'ও বদলায়, আর মূল্যমানের দিক থেকেও এ পরিবর্তন অনিবার্য।

সম্পদ সৃষ্টি ও আয়ের অসমতা

উদ্যোক্তারা নিরন্তর তাঁদের কার্য-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এধরণের বিরল সম্পদকে সুলভ করে তোলেন এবং আজকে মানুষের কাছে যেসব পণ্য বিলাসিতা, ভবিষ্যতে একই পণ্যকে মানুষের জীবন মানোন্নয়নে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীতে রূপান্তরিত করেন। দৃষ্টান্ত হিসেবে; গাড়ি, সেলফোন, ও কম্পিউটার। শত বছর আগে মাত্র হাতে গোনা কিছু লোক ছাড়া কারও গাড়ি কেনার সাধ্য ছিল না। কিন্তু আজ আর সে অবস্থা নেই। গাড়ি এখন উন্নত বিশ্বের প্রতিটি পরিবার বা সংসারের জন্য অপরিহার্য প্রয়োজনীয় একটি পণ্য। ১৯৯০-এর দশকে সেলফোন আকারে ও ওজনে ছিল বেশ বড় ও ভারী। একটি বাক্সের মতো। আজকে সেলফোন আকারে ছোট, দামে সস্তা। সকলেই এখন সেলফোন ব্যবহার করে। সেলফোন এখন স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য। পণ্যের এই রূপান্তরকরণের প্রক্রিয়ায় উদ্যোক্তারা সাধারণ মানুষের জীবনমাত্রার মান উন্নয়নে তাদের জ্ঞান ও দক্ষতাকে আমাদের বাস্তব জড়জগতে প্রয়োগ করেন। এ হলো উদ্যোক্তাদের উদ্ভাবনী ক্ষমতার সুফল।

তাই অর্থনীতি কেবল সম্পদ বিলি-বরাদ্দের বিষয় নয়, বরং অকেজো, অনুপযোগী, অনর্থক দ্রব্য বা পদার্থকে রূপান্তরের মাধ্যমে দরকারী, কার্যকর ও উপকারী সম্পদ সৃষ্টি করাও অর্থনীতির বিষয়। এই রূপান্তরকরণের প্রতিটি স্তরে উদ্যোক্তা তার উদ্যোগ ও মূলধন ব্যবহারের মাধ্যমে নিজের জন্য সম্পদ সৃষ্টি করে। সম্পদ সৃষ্টির এই স্তরগুলোতে আয়, মজুরি ও মুনাফার বিলি-বন্টণে অসমতা ও বৈষম্য সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়।

সম্পদ সৃষ্টি ও নৈতিকতা

সম্পদ সৃষ্টির বড়ো উৎস হলো মানুষের মস্তিষ্ক ও মনন ও পুজি বিনিয়োগে ঝুঁকি। জ্ঞান ও দক্ষতার ব্যবহার এবং ঝুঁকি গ্রহণ করে একজন উদ্যোক্তা যতো আয় করেন বা লাভ করেন ততো অর্থ তার প্রয়োজন নেই। তার প্রয়োজন মেটাতে সৃষ্ট সম্পদের সামান্য অংশই যথেষ্ট। তবে উদ্যোক্তা দিন দিন পণ্য ও সেবা উৎপাদনের মাত্রা বাড়ায় এবং পণ্যের গুণগত মান উন্নয়নে সচেষ্ট থাকে। পণ্য উৎপাদনের মাত্রা ও মান উন্নত করে মূল্য কমানোর প্রয়াসে তাকে সঞ্চিত মূলধন থেকে পুনর্বিনিয়োগ করে যেতে হয়। এ প্রক্রিয়া একদিকে যেমন উদ্যোক্তার সম্পদ প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি করে, অন্যদিকে উচ্চমানসম্পন্ন পণ্য কম মূল্যে সরবরাহের মধ্য দিয়ে ভোক্তার জীবনমান উন্নীত করে। এমনি করে সমাজে অনেকে উপকৃত হয় ও সেইসাথে উদ্যোক্তার সম্পদও বহুগুণে বেড়ে যায়। নিজের জন্য সম্পদ সৃষ্টি এবং একই সাথে সমাজে অন্যদের জন্য নিরবচ্ছিন্ন সুবিধে সৃষ্টি করা উৎপাদনের গতিময় প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়া একদিকে মানুষের উদ্যোগ ও উদ্যমের সুষ্ঠু ব্যবহার করে। অন্যদিকে, অধিকতর পরিমাণে উন্নতমানের পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহের প্রেরণা জোগায়। যথাযথ সরবরাহ থাকলে, পণ্যের মূল্য সস্তা (বাজারভিত্তিক) থাকবে। এ হলো অর্থনীতির তত্ত্ব। প্রথিতযশা মার্কিন সাংবাদিক ওয়াল্টার লিপম্যান তাঁর 'দ্য গুড সোসাইটি (১৯৪৩)' গ্রন্থে লিখেছেন; মানব ইতিহাসে প্রথমবারের মতো মানুষ "সম্পদ তৈরির একটি পথ খুঁজে পেয়েছে, যে পথ অবলম্বনে উদ্যোক্তার সৌভাগ্য বহুগুণে বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে অন্য সব মানুষেরও সৌভাগ্য সুচিত হয়"। এ প্রক্রিয়া শেষ পর্যন্ত অর্থনীতিতে একটা নির্ভরযোগ্য সোনালী নিয়মে পরিণত হয়েছে। এ প্রক্রিয়া উৎপাদন ও অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে যথার্থ ও সুষ্ঠু। একইসাথে এ প্রক্রিয়া এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে, যেখানে "মানুষ প্রথমবারের মতো এমন এক শৃঙ্খলাবদ্ধ সমাজ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। সেই প্রাচীনকাল থেকে মানুষ সমাজে যে স্বাধীনতা, ভ্রাতৃত্ব ও সমতা ও নৈতিকতা আশা করেছিল, তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সমাজে একদিকে যেমন সম্পদ বাড়বে, অন্যদিকে অভাব থাকবে না"।

প্রাচীনকাল বনাম সাম্প্রতিককাল

তবে বর্তমানে এই ধারার চিন্তা-ভাবনা বদলে গেছে। এখন অনেকেরই ধারণা, "একজন ব্যক্তি মানুষের মুনাফার নিহিতার্থ হলো আরেকজনের লোকসান"। এ ধারণা পোষণকারীরা সম্পদ সৃষ্টিকে দারিদ্র্য ও অভাব তৈরির উৎস হিসেবে গণ্য করেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুন্নত অর্থনীতির একটা গুরুত্ববহ বৈশিষ্ট্য"। এই দৃষ্টিভঙ্গির মর্মার্থ হলো; "প্রতিটি ব্যবসায়ী তার কর্মচারী ও গ্রাহকবর্গকে ঠকাচ্ছেন। সে নিত্য প্রতারণা করে। সে আয় গোপন রেখে সরকারের কর ফাঁকি দেয়। যদি সে কর ফাঁকি না দিতো তাহলে সরকার সেই সম্পদ পুনর্বণ্টনের মাধ্যমে সমাজে বৈষম্য ও অসমতা দূর করতে পারতো। সমাজে বহু মানুষের মনে এই ধারণা যথেষ্ট উজ্জ্বল। এতে বোঝা যায়, সামাজিক অসমতা ও বৈষম্যে সৃষ্টির উৎসকে তারা একমাত্র সম্পদ সৃষ্টির মাঝেই খোঁজেন। এখানেই অর্থনীতি নৈতিকতার কাছে হার মানে।

সমাজে যতোদিন এমন ধ্যান-ধারণা বিরাজ করবে, যেমন সম্পদের পুনর্বণ্টন হলো অসমতা ও বৈষম্য দুরীকরণের উৎকৃষ্ট হাতিয়ার ততোদিন দারিদ্র্য যেমন দুর হবে না, তেমনি বৈষষ্য ও অসমতাও কমবে না। কেননা সম্পদ পুনর্বণ্টনের জন্য প্রথম কাজটি হলো সম্পদ সৃষ্টি। সম্পদ সৃষ্টির মাঝে কোনো না কোনোভাবে বৈষম্য ও অসমতা বিরাজমান। অন্যদিকে, সম্পদের পুনর্বণ্টন ও রাজনীতি এ দুটো বিষয় একে অন্যের ছায়ার মতো সবসময় কাছাকাছি থাকে। এ সমস্যার সম্বোধন ও সমাধান নির্ভর করে দেশের

রাজনীতি, রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও রাজনীতিকদের উপর। তাই, অনিবার্যভাবেই যে কোনো দেশে রাজনীতির উৎকর্ষ-মান, রাজনীতিকদের পরিণামদর্শিতা, নীতি, নৈতিকতা, নিয়মনিষ্ঠা ও তাঁদের নিজ গুণাবলীর মাঝে নিহিত থাকে সমাজে বৈষম্য, অসমতা ও নৈতিকতার মাত্রা বা পরিমাণ। ব্যবসায়ী, অর্থনীতিবিদ বা সুশীল সমাজের অন্যান্য গোষ্ঠী সমাজে নৈতিকতার মাত্রা উন্নয়নে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করতে পারে, তবে কোনোদিন বৈষম্য ও অসমতা দূরীকরণের মাধ্যমে নৈতিকতার পরিমাণের নির্ধারক হতে পারবে না।

অগণতান্ত্রিক একনায়কত্বের অনৈতিকতা

সাধারণ মানুষ আশা করেছিল, স্বাধীনতা এদেশে নৈতিকতার ভিত্তিতে রাজনৈতিক স্বাধিকার, সামাজিক অগ্রগতি এবং অর্থনৈতিক সাফল্য আনবে। কিছুই হয়নি তা বলা যাবে না। তবে তা প্রত্যাশার তুলনায় নগণ্য। যেটুকু সাফল্য অর্জিত হয়েছে সেটুকু নৈতিকতাভিত্তিক কিনা বলা বড় মুস্কিল। দিনদিন জনগণের সেই স্বপ্ন দুঃস্বপ্নে পরিণত হচ্ছে। জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করে ক্ষমতা দখল করেছে স্বৈরশাসন। আবার কখনও প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে স্বৈরশাসনের পরিবর্তে গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব, জনগণ সত্যিকার গণতন্ত্রের স্বাদ কখনো পায়নি।

প্রকৃতপক্ষে, অগণতান্ত্রিক রাজনৈতিক অবকাঠামো-নির্ভর সমাজে একই সাথে অর্থনৈতিক, আর্থিক ও সামাজিক ভিত্তি নির্মাণের প্রচেষ্টা ছাড়া শুধু গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা বিপদ ও ভয়াবহ সংকটকে আমন্ত্রণ জানানো ছাড়া আর কিছু নয়। আমাদের অকপটে স্বীকার করতেই হবে যে, একটি উন্নত অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভিত্তির লক্ষ্য থেকে আমরা অনেক দুরে অবস্থান করছি। বর্তমানের কথাই ধরা যাক, এখনও জনসংখ্যার শতকরা ৩০ ভাগ লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। জাতি গঠনে ইচ্ছুক এবং উৎপাদনমুখী কাজে অংশগ্রহণে সক্ষম লক্ষ কোটি মানুষ হয় বেকার, অর্ধ-বেকার কিংবা অনুৎপাদনশীল।

উন্নত জীবনের নামে তারা সুযোগ পেলেই সরকার বদল করেছে। স্বৈরশাসনের পরিবর্তে নির্বাচিত সরকার ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাও প্রচলনের চেষ্টা করেছে। তারা দেখেছে, এতে মুষ্টিমেয় কিছু সংখ্যক লোকের ভাগ্যের পরিবর্তন হলেও দরিদ্র জনগোষ্ঠী সেই তিমিরেই রয়ে গেছে। সমস্যা জর্জরিত এই বৃহৎ জনগোষ্ঠী তাদের চাহিদার কথা, আকাংখার কথা, সামাজিক অসঙ্গতির কথা আজ মুখ ফুটে বলতে বা প্রকাশ্যে উচ্চারণ করতেও যেন ভয় পায়। করতে চাইলেও পুলিশ দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়। অগণতন্ত্রবাদীদের মুখে নিত্য-নিয়ত শোনা যায় যে, দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই সেই চূড়ান্ত সময় এখন আমাদের সামনে উপস্থিত যখন আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে সমাজকে গণতন্ত্রায়নের মাধ্যমে সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠার। এ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলোর জন্য প্রথম ও সর্বাগ্রে করণীয় হলো "নিজেদের ঘর সামলানো, যাতে অর্থনীতি বিকশিত হয়। তুলনামূলক ও প্রতিযোগিতামূলক সুবিধানীতির মাধ্যমে শিল্পোন্নত দেশগুলোর সাথে প্রতিযোগিতায় সক্ষম হয়ে উঠে"।

বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা, সামাজিক বিশৃঙ্খলা, কতিপয় ব্যক্তির হাতে পুঞ্জীভূত ক্ষমতা, তাদের স্বৈরতান্ত্রিক ও অসাংবিধানিক আচার-আচারণ, আইনের শাসনের দুর্বলতা, অকার্যকর প্রতিষ্ঠান, বিধি-বিধানের অতিমাত্রায় অপব্যবহার ও নিচুমানের দুর্বল শাসন ব্যবস্থা বর্তমানে বড় উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিচুমানের শাসন দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জন ও দারিদ্র্য হ্রাসের পথে এখন এক পর্বতপ্রমান বাধা। শাসনে দুরবস্থা জাতীয় অর্থনীতি, আর্থিক ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠানগুলোকে কুরে কুরে খাচ্ছে। বাংলাদেশকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে অবনতির অতল গহ্বরে। সেই সাথে দেশের শ্রমজীবি মানুষগুলোকে তাদের সম্ভাবনা

ও সুযোগ থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। তাদের প্রাপ্য সামাজিক ন্যায়বিচার, সম্প্রীতি, নিরাপত্তার পরিবেশ ও নিত্যনূতন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের সুফল কেড়ে নিচ্ছে।

উপসংহার

বাংলাদেশ এখন তার নিয়তির নানা পথের এক মিলন মোহনায় এসে থমকে গেছে। এ সত্য মেনে নিতেই হবে যে আগামী কয়েক দশকের পরিক্রমায় বাংলাদেশের সাফল্য বা ব্যর্থতা নির্ভর করবে দেশে গণতন্ত্র, সুশাসন, রাজনৈতিক ও সামাজিক মূলধন সৃষ্টির মাধ্যমে আর্থিক বিনিয়োগ বাড়ানো। আর সেজন্যই আমাদের জনসমাজে একটি সুগভীর পরিবর্তন প্রয়োজন। সমাজের পরিপূর্ণ অর্থনৈতিক সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করতে, আয়ের বৈষম্য এবং ধনী ও গরিবের ব্যবধান কমাতে হলে অর্থনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, আইন বিশারদ, সমাজ কর্মী, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা, ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী তথা সুশীল সমাজের সবাইকে অবশ্যই চিরায়ত উদারনৈতিকতার দর্শনকে সামনে রেখে দেশের রাজনীতি, আইনের শাসন, সামাজিক মূলধন সৃষ্টি, উৎপাদন প্রক্রিয়া ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে সব বাধাবিপত্তি সরাতে হবে। আমাদের সমবেত প্রচেষ্টায় দেশে অর্থনৈতিক প্রাণচাঞ্চল্য ও গতিশীলতা ফিরে আসবে, বিনিয়োগ বাড়বে, সম্পদ বাড়বে, অধিকহারে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে, সাথে সাথে দেশের মানুষ তাদের অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতাকে কাজে লাগাতে পারবে এবং এতে একদিকে সামাজিক অস্থিরতা প্রশমিত হবে, অন্যদিকে আর্থিক মূলধন বিনিয়োগ বাড়বে এবং সম্পদ ও আয়ের বিলি-বণ্টনে বৈষম্য কমে আসবে। অন্যথায়, বাংলাদেশের লাখো কোটি মানুষ বহুমাত্রিক বৈষম্য ও অনৈতিকতার মাঝে দাঁড়িয়ে অসহায়, নীরব ও স্থবির দর্শকের মতো শুধু দেখেই যাবে "মানব সৃষ্ট এক ভয়াবহ দুর্যোগ"।